রবীন্দ্র অনুভবে পরাধীন ভারতবাসী নবেন্দুশেখর : ‘রাজটিকা’ গল্পের আলোকে

ড০ রীতা রাণী দে

ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ‘রাজটিকা’ গল্পটি রচনা করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের প্রিয় ভারতবাসীদের ‘রায়বাহাদুর’ ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের উপাধি প্রদান করত। সেকালের অনেকেই এই ধরনের উপাধি পাওয়ার আশায় দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজদের সেবা-যত্ন করে জীবন কাটাত। ইংরেজদের তুষ্ট করার জন্য হাত জোড় করে নতমস্তকে ভয়ে ভয়ে তারা সারাক্ষণ তাদের তোষামোদ এবং খোশামোদ করে চলত। ইংরেজরা খারাপ পেতে পারে অথবা অসন্তুষ্ট হতে পারে,--- সেই ভয়ে দেশহিতমূলক কাজকর্ম থেকে তারা পূর্ণরূপে বিরত থাকত। এমনই একজন ব্যক্তি হল নবেন্দুশেখর। গল্পে দেখা যায়, নবেন্দুশেখরের আত্মীয়েরা তাকে ইংরেজভক্ত থেকে দেশভক্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত নবেন্দুশেখরের ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি লাভ করা হল না। ---- এই বিষয়গুলিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৌতুক রসে জারিত করে এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন।---- ইত্যাদি বিষয়গুলি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। তাই **“রবীন্দ্র অনুভবে পরাধীন ভারতবাসী নবেন্দুশেখর : ‘রাজটিকা’ গল্পের আলোকে”** শীর্ষক গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে শুধুমাত্র নবেন্দুশেখরের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

নবেন্দুশেখর : গল্পে বলা হয়েছে, নবেন্দুশেখরের পরিবার তাঁর পিতা পূর্ণেন্দুশেখরের আমলেই ইংরেজদের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি লাভ কারার স্বপ্ন দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত ‘রায়বাহাদুর’ পদবী লাভ করার পূর্বেই মারা যান। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাব বর্জিত লোকে গমন করিলেন।”[১] পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী নবেন্দুশেখর সেই ধারা বজায় রেখে তার পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি

লাভের লোভ উত্তরাধিকার সূত্রে তার মধ্যে এসেছে। পিতার মতো সেও আশা করছে ইংরেজপ্রদত্ত ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি সে অবশ্যই লাভ করবে। অন্ধ ইংরেজভক্তিও পিতার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি লাভ করার লোভে সেই ভক্তির ভাণ্ডার নিয়ে আজকাল সে ইংরেজদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছে। সেই সময়ের সমাজে এই ধরনের লোভী লোকের অভাব ছিল না যারা নিজেদের কুমনোবৃত্তির ফলে ইংরেজদের চরিত্রকেও কালিমালিপ্ত করে তুলত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, “আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়।” [২]

এমন অবস্থায় বিপত্নীক নবেন্দুশেখর পুনর্বিবাহ করেছে। তার বর্তমান শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ তার স্ত্রী অরুণলেখার পরিবারে এককালে অন্ধ ইংরেজ অনুকরণ থাকলেও আজকাল নেই। অন্ধ ইংরেজভক্তি ছেড়ে দিয়ে আজকাল তারা খাঁটি দেশপ্রেমী হয়ে উঠেছে। নবেন্দুশেখর শ্যালিকাদের কাছে ইংরেজদের সঙ্গে তার পরিবারের সুসম্পর্কের কথা প্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করে। তার শ্যালিকারা তার ইংরেজ তুষ্টি এবং ইংরেজ ভক্তির কথা জানতে পারে। সত্যিকারের দেশভক্তরা এই ধরনের ইংরেজভক্তি পছন্দ করে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ অনুকরণের প্রসঙ্গে বলেছেন, “যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপে গৌরব করিতে বসিলে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া।” [৩]--- এই গল্পে বন্ধুর কর্তব্য করেছে নবেন্দুশেখরের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনেরা।

ভারতবর্ষের পরিবার প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব বেশি ভালবাসতেন। জামাইবাবু এবং শ্যালীদের মধ্যে হাসি-তামাশার একটা সম্পর্ক ভারতবর্ষের পরিবারে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পকার গল্পে শ্যালীদের দ্বারা কয়েকটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনার অবতারণা করে ইংরেজদের প্রতি তাদের জামাইবাবুর (নবেন্দুশেখরের) অন্ধ ভক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। যেমন,--- নবেন্দুশেখরের শ্যালী লাবণ্যলেখা এক জোড়া বিলাতি

বুটকে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে দেবতার মতো সাজিয়ে শুভ তিথি দেখে তার সামনে ফুল-চন্দন রেখে ধূপধুনা এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিষ্ঠা করে। নবেন্দুশেখর ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই শ্যালী তার কান ধরে বলে, "তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।" [৪] নবেন্দুশেখরের আরও একজন শ্যালী কিরণলেখা সেও নিজের হাতে বিখ্যাত ইংরেজদের নাম লিখে নামাবলি বানিয়ে তাকে উপহার দেয়। এই সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন, "কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ ব্রাউন টমসন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।"[৫] নবেন্দুশেখরের অপর একজন শ্যালী শশাঙ্কলেখাও তার ইংরেজভক্তিকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, "ভাই, আমি একটি জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জপ করিবে।"[৬] সে বয়সে ছোট বলে সবাই তাকে জ্যাঠামি করতে মানা করে। শ্যালীদের ব্যবহারে তার লজ্জা এবং রাগও হল। কিন্তু সে তা কোনো মতেই প্রকাশ করতে পারল না। কিন্তু পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'সেলামশক্তি' এত শীঘ্র ত্যাগ করা সম্ভব নয়, অপরদিকে শ্যালীদের ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। তাই তখন থেকে সে গোপনে শ্যালীদের কাছে মিথ্যে কথা বলে ইংরেজদের সেলাম করতে যাওয়া শুরু করে। তার এই দুষ্টামিও শ্যালীরা বুঝতে পারল। এমন অবস্থায় শোনা গেল, মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দুশেখরের 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করার সম্ভাবনা আছে। তার স্ত্রী অরুণলেখা চাচ্ছিল না, তার স্বামী 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করুক। সে তার দুঃখের কথা তার দিদি লাবণ্যলেখাকে জানায়। লাবণ্যলেখা তাকে বলে, "তা বেশ তো, রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লজ্জাটা কিসের।" [৭]--- বুঝতে পারা যায়, 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করাটা গর্বের নয়, লজ্জার বিষয়।

নবেন্দুশেখরের পিতার আমল থেকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করার যে চেষ্টা চলছে, সে সেই চেষ্টার সুফল পেতে চলেছে। নতুন করে আর কিছু করার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি সে অনেক খরচ করে ইংরাজদের প্রিয় শহরে একটি ঘোড়া দৌড়ের

স্থান তৈরি করে দিয়েছে। এই সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন, “নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।” [৮] কিন্তু তখনও তাকে পদবীর লোভের খপ্পর থেকে বের করে খাঁটি দেশ প্রেমী তৈরি করার অভিযান তার শ্যালীরা এবং আত্মীয়রা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই বিষয়ে তার শ্যালীরা এবং তাদের পরিবার শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছে।

ভারতবর্ষে পরিবারের কেন্দ্রে থাকে মেয়েরা। যারা কোনো কারণে দূরে সরে গেছে, নিজেদের আদর-যত্ন দিয়ে তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে পরিবারের মেয়েরা। গল্পে দেখা যায়, লাবণ্য তার স্বামীকে কর্মস্থল থেকে বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ জানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, “আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারে অতিথি ; তাঁরাই আমাদের সর্বদা বহু যত্ন আদর করে রেখে দিয়েছেন।” [৯]--- এই গল্পের লাবণ্যের মধ্যে খাঁটি অতিথি সৎকারের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বামী সৌভাগ্যবতী নারীরা কপালে সিঁদুর লাগিয়ে হাসি মুখে নিজের পরিবারটিকে স্নেহে-প্রেমে-ভালবাসায় ভরিয়ে রাখে। গল্পে দেখা যায়, লাবণ্য নিজের গুণে তার পরিবারটিকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, “আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প’রে সিঁথির মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদা প্রসন্ন মুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন।” [১০] লাবণ্য এমনই একজন স্বয়ংসম্পূর্ণা নারী। গল্পে দেখা যায়, সে তার স্বামী নীলরতনের জীবন সুখ-শান্তিতে ভরিয়ে রেখেছে। স্ত্রীর নিমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র সে বাড়ি চলে এসেছে। সেই সংসারে অতিথি হয়ে এসেছে নবেন্দুশেখর। সম্পর্কে নবেন্দুশেখর লাবণ্যের ছোট বোনের স্বামী। সে তাকে ইংরেজভক্তি মুক্ত করার চেষ্টা করে। লাবণ্যের সেবা যত্নে সে সেখানে খুব সুখে দিন যাপন করতে লাগল। গল্পকার বলেছেন, “সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।” [১১] সেই সুখের দিনে সে ইংরেজ-ভক্তি প্রায় ভুলে গেল। যে ব্যক্তি একসময় ইংরেজের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার জন্য গর্বিত ছিল, এখন সে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গর্ব অনুভব করে। এই সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন,

“সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এ কথা সে উপস্থিত মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।”[১২] ইংরেজতুষ্টি এবং ইংরেজভক্তি যার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল, তারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, এমন কোনো কাজ যে বিন্দুমাত্র করা পছন্দ করত না,--- সেই ব্যক্তি কংগ্রেসের জন্য চাঁদা দিয়েছে। অবশ্য তাকে বলা হয়েছিল, তার নাম প্রকাশ করা হবে না। লাবণ্য তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, এই কথা ফাঁস হয়ে গেলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ মাটি হয়ে যেতে পারে, কোনো ইংরেজ তার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খেতে আসবে না—ইত্যাদি। কিন্তু সে কংগ্রেসের বল বৃদ্ধি করেছে। ---- এই খবরটি চাপা থাকল না, পরদিনের কাগজে জনৈক ব্যক্তি বিস্তারিত ভাবে তা প্রকাশ করে দেয়। নবেন্দুশেখর যে সাধারণ লোক নয়, তাকে দলে আনার জন্য একদিকে ইংরেজ এবং অপরদিকে কংগ্রেস--- সারাক্ষণ ছিপ নিয়ে বসে থাকে,--- এই কথাটা বোঝাবার জন্য সে কাগজটি লাবণ্যকে দেখায়। এই লেখাটার একটা প্রতিবাদ আবার কাগজে ছাপা হয়। সেখানে নানা ধরনের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে, নবেন্দু এমন কাজ করতেই পারে না। ইংরেজদের দরবারের সে কোনো অস্থায়ী সদস্য নয় ;--- যে বিলাত থেকে ফিরে এসে ইংরেজদের নকল করে তাদের দরবারে ঢুকতে গিয়ে উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার জন্য হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। আবার সে কর্মশূন্য উমেদার অথবা মক্কেলশূন্য উকিলও নয়--- যার জন্য শেষ পর্যন্ত সে কংগ্রেসের শরণাপন্ন হবে। সে একজন ব্যক্তিত্ববান খাঁটি ইংরেজভক্ত। চিতাবাঘের সঙ্গে তুলনা করে সেই কাগজে বলা হয়েছে, “চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও তেমনি কংগ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে,......।”[১৩] ---- অর্থাৎ এত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইংরেজ দরবারে বিমুখ হয়ে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি করতে যাবে, সেটা অসম্ভব। এগুলো শুধুমাত্র তার শত্রুরাই বলতে পারে।--- এই কথাগুলির কোনো সত্যতা নেই। ---- লাবণ্য এবং তার স্বামীর প্ররোচনায় সে এই লেখাটার একটা জবাব লিখে পাঠাল। তার বক্তব্য হল, পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারতবর্ষের শত্রু নয়,

ভারতবর্ষের আসল শত্রু হল, অ্যাংলোইন্ডিয়ান মানুষগুলি। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতবাসীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু এই পত্রিকাগুলোর দুষ্ট মানসিকতার জন্য সেটা সম্ভব হয়ে উঠে না। --- লেখাটা লিখে মনে মনে তার ভয় করছিল।

পরলোকগত পিতা অনেক কষ্ট করে ইংরেজের প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন, এই কাজে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি বলে সে বার বার অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। যেমন,---

ক) “কনগ্রেসের বলবৃদ্ধি ! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর ! কনগ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে !”[১৪]

খ) “হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর ! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে !”[১৫] ---- ইত্যাদি।

--- এমন অবস্থায় একদিন সে নিজের শরীরে তেল মালিশ করছিল, সেই সময় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাড়াতাড়ি স্নান সেরেও তার সঙ্গে সে দেখা করতে পারে না। বেহারার কাছ থেকে সে জানতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন। দুশ্চিন্তায়, অনুশোচনায় সে ছটফট করতে থাকে। সে মনে মনে ভাবে, “একে আমি কনগ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!”[১৬] ---- নিজেকে পিতার দেখানো সঠিক পথে চালনা করতে চায় সে। ম্যাজিস্ট্রেট অসন্তুষ্ট হয়েছে মনে করে, ক্ষমা চাওয়ার জন্য সে তার কাছে চলে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলে স্বীকার করলেন না। তাঁর সত্যি কথাতেও সে শান্তি পেল না।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে লাবণ্যকে নিয়ে নীলরতন কলকাতায় এসেছে। নবেন্দুশেখরও তাদের সঙ্গে কলকাতায় আসে। কংগ্রেসের

লোকেরা তাকে খুব আনন্দের সঙ্গে স্বাগতম জানায়। তখনও সে মন থেকে কংগ্রেসের সভায় যোগ দেয়নি। তার অজান্তেই পরিস্থিতি তাকে দেশনায়ক করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত তার আর 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করা হল না। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা লাবণ্যলেখা মহাসমারোহে নতুন কাপড় পরিয়ে, রক্ত চন্দনের তিলক পরিয়ে দেশমাতৃকার নতুন সেবক নবেন্দুশেখরকে বরণ করল। সব শ্যালিরা তাকে নিজের হাতের তৈরি মালা পরাল। শ্যালীদের চেষ্টায় ইংরেজ প্রেমী থেকে দেশপ্রেমী হয়ে উঠল নবেন্দুশেখর। নবেন্দুশেখরের গৃহে প্রত্যাবর্তন হল।

অযোগ্য স্থানে ভক্তি করা উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে ইংরেজ, ক্ষমতাবান এবং উচ্চপদে বিরাজমান বলেই সে কারো ভক্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয়, যেমন টাকা পদবী গায়ের জোর, এবং অমূলক প্রথা,--- যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফলা হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান সাধনা।"[১৭] ইংরেজদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে কুপথে তাদের তুষ্ট করে উপাধি লাভ করার ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করতে হবে। তা নাহলে ইংরেজ ভিক্ষা দেবে এবং ভারতবাসী ভিক্ষা গ্রহণ করবে। এবং তাতে কোনো পক্ষেরই মান বাড়বে না। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে।"[১৮] রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হতে হয়। এই গল্পে তাঁর ভাবনাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন সময়ে তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে।

উপসংহার : আলোচনা শেষ করার পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে খুব সংক্ষেপে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল,----

ক) অন্ধ অনুকরণ এবং অন্ধভক্তি দুটোই ভাল নয়।

খ) কেউ ভুল পথে এগিয়ে গেলে তার পরিবারের লোকেরা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

---- পরাধীন ভারতবাসীদের অন্ধ ইংরেজভক্তি, ইংরেজতুষ্টি এবং ইংরেজ অনুকরণ তাদের জন্য অভিশাপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে সেই মানুষগুলিকে সাবধান করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রাজটিকা’, ‘গল্পসমগ্র’, দ্রষ্টব্য : Web Page. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzaXJpenZ5Y29tfGd4OjQ5MDk3YjVhMzBiMzkyZmI, Date of Retrieval : 25.12.2020, পৃ. ৫৯৮

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘পূর্ব ও পশ্চিম’, ‘সমাজ’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, ১২শ খণ্ড, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৭০

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘নকলের নাকাল’, ‘সমাজ’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, ১২শ খণ্ড, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৩৫

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রাজটিকা’, ‘গল্প সমগ্র’, দ্রষ্টব্য : Web Page. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzaXJpenZ5Y29tfGd4OjQ5MDk3YjVhMzBiMzkyZmI, Date of Retrieval : 25.12.2020, পৃ. ৬০১

৫। তদেব, পৃ. ৬০১

৬। তদেব, পৃ. ৬০১

৭। তদেব, পৃ. ৬০২

৮। তদেব, পৃ. ৬০৪

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’, ‘সমাজ’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, ১২শ খণ্ড, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৪২

১০। তদেব, পৃ. ২৩৯

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রাজটিকা’, ‘গল্প সমগ্র’, দ্রষ্টব্য : Web Page. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzaXJpenZ5Y29tfGd4OjQ5MDk3YjVhMzBiMzkyZmI, Date of Retrieval : 25.12.2020, পৃ. ৬০৩

১২। তদেব, পৃ. ৬০৪

১৩। তদেব, পৃ. ৬০৬

১৪। তদেব, পৃ. ৬০৬

১৫। তদেব, পৃ. ৬০৭

১৬। তদেব, পৃ. ৬০৯

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘অযোগ্য ভক্তি’, ‘সমাজ’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, ১২শ খণ্ড, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৫২

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘পূর্ব ও পশ্চিম’, ‘সমাজ’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’, ১২শ খণ্ড, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৭২

....

ডঃ রীতা রাণী দে, সহকারি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নগাঁও গার্লস কলেজ, নগাঁও, আসাম, Pin. 782002

Ph. 9706334316, Mail : sky.abc007@yahoo.in

....